International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-V, September 2022, Page No. 01-08
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i5.2022.1-08

ভারত-নেপাল সম্পর্ক: চিন এক অস্থিরতার ধারা

বিজয় মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মানকর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract:
India shares antique and unique relationship with Nepal. The basis of this bilateral relation between India and Nepal is formed by the Indo-Nepal Treaty of Friendship and Peace of 1950. This treaty provided India an opportunity to regulate the foreign policy of Nepal. Recently Nepal's Prime Minister Sher Bahadur Deuba visited India and initiated a number of programmes with the Indian government. Nepal is a buffer state between India and China which maintaining a balance of power in the South Asian region. But China's involvement in Nepal has been a matter of great concern and a major threat for the security of India. In this context, this article attempts to assess the various challenges that this relationship faces in addition to the China factor.
Keywords: Indian Foreign Policy, Nepal Foreign Policy, South Asia, trilateral relationship, Foreign Policy of China, Democracy.

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ভারত ও নেপালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কগুলি ঐতিহ্যগতভাবে খুব ঘনিষ্ঠ। উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে নেপালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা আবশ্যক। নেপাল দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত এমন একটি দেশ, যা পরিচিত বিশ্বের বহু প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পয়েন্ট মাউন্ট এভারেস্ট, রাজধানী শহর কাঠমান্ডু, বৌদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান, SAARC এর সদর দপ্তর প্রভৃতি নানান পরিচয়ে। নেপালে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় শাহ রাজবংশের হাত ধরে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনের সাথে রানা বংশের অধীনে নেপাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাথে জোট গঠন করে, তবে নেপাল কখনোই ব্রিটিশ উপনিবেশ হয়নি। ইতিহাসে ফিরে তাকালে দেখা যায় আজকের নেপালের যা মানচিত্র, অতীতের নেপাল ছিল আরো বৃহৎ। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের সাথে নেপাল এক বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, যার ফলস্বরূপ সগৌলির সন্ধি দ্বারা পূর্বে ও পশ্চিমে নেপালের অঙ্গচ্ছেদন করা হয়। তাই ব্রিটিশ ভারতের সাথে নেপালের সম্পর্ক ভালো না হলেও স্বাধীন ভারতের সাথে নেপালের সম্পর্ক ছিল ইতিবাচক। নেপালে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে, তবে দুইবার ১৯৬০ ও ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে নেপাল সাম্রাজ্য কর্তৃক এখানে গণতন্ত্র স্থগিত হয়। যাইহোক শেষমেষ ১৯৯০ ও ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে পরপর দুইবার নেপালি গৃহযুদ্ধের ফলে ২০০৬ সালে শান্তি চুক্তির দ্বারা বিশ্বের শেষ হিন্দু রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ২০০৮ সালে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্ররূপে নেপাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

নেপালের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ভারত ও ***চিনের*** মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২০ এর দশকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলন চলাকালীন বহু শিক্ষিত নেপালি জনগণ ভারতে এসেছিল এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্পৃহা ও বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা নেপালে নেপালি কংগ্রেস গঠন করে। যা পরবর্তীকালে নেপালি কংগ্রেস ও নেপালের এলিট জনগণ যৌথভাবে একটি আন্দোলনের মাধ্যমে নেপালের রানা বংশের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। রানা বংশের অবসান ঘটলেও এখানে রাজতন্ত্র নেপালি রাজনীতিতে নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। এই সময় নেপালের ইতিহাসে তিনজন উল্লেখযোগ্য রাজা ত্রিভুবন, মহেন্দ্র এবং বীরেন্দ্রের নাম করা যায়। পরবর্তীকালে ১৯৫১ সালে এক সাধারণ নির্বাচনে নেপালি কংগ্রেসের জয় ঘোষিত হয়। কিন্তু তবুও ১৯৫১-১৯৫৯ এর সময়কালে রাজা ত্রিভুবন ও তার উত্তরাধিকারী এবং নেপালি কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলে। ১৯৫৯ সালে রাজা মহেন্দ্র বীরবিক্রম সাহো নেপালি কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে 'দলহীন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠা করেন, যার ফলে ১৯৬০ এর পর থেকে নেপাল রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় শাসন লক্ষ করা যায়। যার প্রতিবাদে ১৯৯০ সালে নেপালে প্রথম জন আন্দোলন গঠিত হয়। এছাড়াও ১৯৯০ এর দশকে নেপাল রাজনীতিতে নেপালি কংগ্রেসের পাশাপাশি চিনের মদতে কমিউনিস্ট পার্টি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। নেপালে কমিউনিস্ট পার্টি নেপাল জনগণের নিকট এই অভিযোগ প্রচার করতে থাকে যে, নেপালি কংগ্রেস মূলত ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত একটি রাজনৈতিক দল। চিনা মদতে পরিচালিত এই কমিউনিস্ট পার্টির মূল উদ্দেশ্য নেপালের জনগণকে ভারতবিরোধী ভাবনায় ভাবিত করা। এই সময় কালে নেপালে রাজনৈতিক দলগুলির চরম দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতির কারণে সাধারণ জনজীবনে নেমে আসে গভীর সংকট। বস্তুত ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সরকারি সম্পত্তি লুট, আগুনে পুড়িয়ে ফেলা, গণহত্যা এইসব ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। যার ফলশ্রুতিতে ২০০৫ সালে নেপালে দ্বিতীয় জনআন্দোলনের জন্ম হয়। শেষমেষ ২০০৬ সালে নেপাল সরকার ও নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটি শান্তিচুক্তির দ্বারা এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে। ২০০৬ এর শান্তি চুক্তি অনুযায়ী ২০১০ এর মধ্যে নেপালের জন্য এক নয়া সংবিধান গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ এক্ষেত্রে সংবিধান রচনার প্রশ্নে নেপালে কমিউনিস্ট পার্টি তথা মাওবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নেপালি কংগ্রেসসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির বারবার মতপার্থক্য, যেমন মাওবাদীগণ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পক্ষে চাইলে অন্যান্যরা সংসদীয় ব্যবস্থাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আবার মাওবাদীগণ এথনিক যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করলে বাকিরা এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। এছাড়াও সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আরেকটি বাধা ছিল মাধেসি সমস্যা। বস্তুত নেপালের জনগণ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। নেপালের উত্তর প্রান্তে পর্বতময় তরাই অঞ্চলে যারা বসবাস করত তাদের 'পাহাড়ি' ও দক্ষিণ প্রান্তে সমতলভূমিতে বসবাসকারী মানুষজন 'মাধেসি' নামে পরিচিত ছিল। পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষজন মাধেসি জনগণের প্রতি নানা প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ ও নিচু চোখে দেখত। এই চাপা উত্তর পরিস্থিতির মধ্যেই ২০ই সেপ্টেম্বর ২০১৫ নেপালের সংবিধান সম্পূর্ণরূপে কার্যকারী হয়।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সূচনা: ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ই জুলাই ভারত ও নেপালের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী "Treaty of Friendship and Peace" স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে ভারত ও নেপাল সর্বদায় শান্তি ও পারস্পরিক বন্ধুত্ব বজায় রাখবে এবং একে অপরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে। উক্ত এই চুক্তিটি নেপালের শেষ রানা প্রধানমন্ত্রী মোহন শমসের জং বাহাদুর রানা এবং ভারতীয় রাষ্ট্রদূত চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ

নারায়ণ সিং -এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তিটিতে মোট দশটি অনুচ্ছেদ রয়েছে, যার দ্বারা উভয় দেশের মধ্যে চিরস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্বের বিধান করে এবং উভয় সরকার একে অপরের সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতাকে স্বীকার ও সম্মান করতে পারস্পরিকভাবে সম্মত হয়। এই চুক্তির ফলে নেপাল ও ভারতের মধ্যে উন্মুক্ত সীমারেখা ব্যবস্থা চালু হয়। এছাড়াও চুক্তির সপ্তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নেপাল ও ভারতের নাগরিকরা অবাধে একে অপরের দেশে ভ্রমন, ব্যবসা, শিক্ষা, চাকরী (সামরিক-বেসামরিক), সম্পত্তির মালিকানা নিতে পারে। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত ছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় দেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করতে হলে নেপালকে ভারতের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে। ভারত ও নেপালের জনগণের মধ্যে রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক, যাকে চলিত কথায় ‘রটি বেটি কা রিস্তা’ বলে অনেকে অভিহিত করেন। বস্তুত ভারতের উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার রাজ্যের ও নেপালের দক্ষিণাংশে বসবাসকারী মানুষজনের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ বর্তমান। কিন্তু এই সুসম্পর্কের মধ্যেও রয়েছে কয়েকটি অমীমাংসিত সমস্যা, যেমন কালাপানি, লিম্পিয়াধুরা, সুস্তা ইত্যাদি, যা উভয় দেশের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে এবং যার পিছনে চিনের মদত লক্ষণীয়। এছাড়াও ১৯৬০ সালের পর থেকে নেপাল দুই দেশের মধ্যে থাকা এই শান্তি ও মৈত্রীতার চুক্তির সমালোচনা করতে থাকে। তাদের অভিমত, নেপালি জনগণের অতিমাত্রায় ভারতে গমন, বসবাস ও পেশাগ্রহণের কারণে নেপালের অর্থনীতি অতিমাত্রায় ভারতনির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, ফলে নেপাল সরকার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। এছাড়াও ১৯৭৫ সালে সিকিম ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে নেপাল সরকার আরো ভীত হয়ে পড়ে। ফলত নেপালের তৎকালীন রাজা বীরেন্দ্র বীর শাহদেব এই চুক্তি সংশোধনের দাবি জানান। এই চুক্তি সংশোধন করা হলে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এই অভিমতে ভারত সরকার চুক্তি সংশোধনে অপারগতা প্রকাশ করেছে।

ভারত-নেপাল সম্পর্কে সম্প্রীতি নেপালের মানচিত্র নিয়ে এক প্রকার উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে, যার পিছনে সম্পূর্ণভাবে রয়েছে চিনের হস্তক্ষেপ। বস্তুত চিন প্রথম থেকেই নেপালকে ভারতবিরোধী একপ্রকার অস্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে। বিশেষ করে চিন নিজের সম্প্রসারণে নীতিকে সামনে রেখে দক্ষিণ এশিয়ায় নিজের একাধিপত্য গড়ে তুলতে ও ভারত মহাসাগরে তথা দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে চিন ভারতের প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশে ভারতবিরোধী ভাবনার বীজ বপন করে চলেছে এবং এক্ষেত্রেও নেপালকে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করতে চলেছে চিন প্রশাসন। সম্প্রীতি ২০১৯ সালে চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং নেপাল সফরে গিয়ে নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে. পি. শর্মা ওলির সাথে বৈঠক করেন এবং নেপালকে ৫০ কোটি ডলার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এর পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে সড়ক ও রেলপথে মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সফরকালে নেপাল প্রধানমন্ত্রী ওলি চিনকে সত্যিকারের বন্ধু বলে অভিহিত করেন। আর এই ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই ভারত ও নেপালের মধ্যে কালাপানি বিবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

ভারত ও নেপালের সীমান্ত বরাবর কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই। বস্তুত আমাদের প্রকৃতি উভয় দেশের সীমানা চিহ্নিত করে রেখেছে অর্থাৎ কোথাও পর্বতশ্রেণী, কোথাও বা উপত্যকার কিনারা, আবার কোথাও নদী প্রভৃতির মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। মোটের উপর উভয় দেশের মধ্যে কিছু স্বল্প তর্কবিতর্ক থাকলেও তারা শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে। কিন্তু নেপালি রাজতন্ত্রের পতন ও নতুন সংবিধান গৃহীত হবার পর থেকে উভয় দেশের সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে ফাটল ধরেছে। বর্তমানে নেপাল প্রশাসন চিনের ইশারায় সাড়া দিয়ে লিপুলেখ, কালাপানি ও লিম্পিয়াধুরাকে নিজের অংশ বলে দাবি

করেছে। বস্তুত সম্প্রীতি ভারত সরকার ২০১৯ সালে জম্মু কাশ্মীরের ৩৭০ ও ৩৫A ধারা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখকে নিয়ে দুইটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করেছে ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে ভারতের নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে কালাপানি, লিপুলেখ এবং লিম্পিয়াধুরাকে ভারতের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এই নতুন মানচিত্রকে নিয়ে নেপাল প্রশাসনের বিরোধ তুঙ্গে। কিন্তু হাস্যকরভাবে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারতের নতুন মানচিত্র ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ভারতের মানচিত্রের একপ্রকার প্রতিরূপ। কালাপানি সমস্যার বীজ নিহিত আছে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে সগৌলির সন্ধি মধ্যে। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধের পরিসমাপ্তি পর ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে নেপাল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সগৌলির সন্ধি স্বাক্ষর করে। এই সন্ধি অনুযায়ী নেপালের উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণের তরাই অঞ্চলের কিনারা, পূর্বে মেচি নদী এবং পশ্চিমে মহাকালী নদী দ্বারা নেপালের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু কালাপানি বিবাদের কারণ নিহিত রয়েছে এই মহাকালী বা কালী নদীর উৎসকে নিয়ে। এই বিতর্কিত কালাপানি অঞ্চলকে ভারত তার উত্তরাখণ্ড রাজ্যের পিথোরাগড় জেলার অংশ হিসেবে এবং নেপাল তার পশ্চিম প্রদেশের দারচুলা জেলার অংশ হিসাবে দাবি করে। সম্প্রতি ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং চিনের সীমান্ত বরাবর দারচুলা থেকে লিপুলেখ পর্যন্ত নতুন সংযোগ স্থাপনকারী রাস্তার উদ্বোধন করেছেন, এই নতুন রাস্তা কৈলাস মানসরোবর যাত্রাপথকে অনেকখানি হ্রাস করেছে।

নেপাল ও চিন উভয় দেশই একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি নেপালের প্রধানমন্ত্রী খড়্গ প্রসাদ শর্মা ওলীর চিনা সফরকালে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ বেইজিং হু শিশেংগ (Beijing Hu Shisheng) এর কথায়,

> "Our [China's] policy is clear – if you [India] want to work with us you are welcome, if not, then at least do not obstruct our work." (Sharma, 2018)

স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্ন থেকেই উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক ও নেপালের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত ইতিবাচক ভূমিকা বহন করে চলেছে। এই বিষয় উল্লেখ্য, ১৯৬০ এর দশকের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে নেপালের মোট বিশ্ববাণিজ্যের প্রায় ৯৬ শতাংশই হত প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে। উভয় দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যেই রয়েছে বিমানবন্দর, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ, শিল্প, বিভিন্ন বৈদ্যুতিক প্রকল্প প্রভৃতির পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্ষেত্রে, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২৯ শতাংশ, যা ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৬ শতাংশ। এছাড়াও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় "Treaty of Trade and Transit" । এই চুক্তি অনুযায়ী ভারতসরকার নেপালকে পশ্চিমবঙ্গের রাধিকাপুর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) মধ্য দিয়ে বাণিজ্য করার সুবিধার্থে ট্রানজিট দেয়। মূলত ভারত নেপালকে বিভিন্ন পেট্রোজাত পণ্য, মোটরগাড়ি ও যন্ত্রপাতি সমূহ, সিমেন্ট, কয়লা, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি করে। অন্যদিকে নেপাল থেকে ভারত সরকার তামার তার, পাইপ, বালি, বিভিন্ন মূল্যবান পাথর, কাঠ প্রভৃতি আমদানি করে থাকে। এছাড়াও নেপালে ব্যাংক, বীমা, টেলিকম, শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও পর্যটন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের প্রায় দেড়শো বিনিয়োগকারী রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নেপালে রয়েছে ভারতের BSNL, TCIL, MTNL, ডাবর, LIC, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, টাটা পাওয়ার, এশিয়ান পেইন্টস, বার্জার পেইন্টস, হিন্দুস্তান ইউনিলভার প্রভৃতি, যা নেপালের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ৪০ শতাংশ বহন করে। এছাড়াও উভয় দেশই সাধারণ সীমানা

রয়েছে ও উভয় দেশের সেনাবাহিনী নিরাপত্তার স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতাকে গুরুত্ব দেয়। ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর গোর্খা সৈন্যদল প্রধানত নেপালের পার্বত্য জেলাগুলি থেকে নিযুক্ত হয়। ২০১৬ সালের এক তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে প্রায় ৩২ হাজার গোর্খা সৈন্য রয়েছে। ভারতীয় ও নেপালি সৈন্যগণ নিয়মিত 'সূর্যকিরণ' নামক যৌথ অনুশীলন করে থাকে, পাশাপাশি নেপালের সৈন্য অফিসারগণ ভারতের দেরাদুনে অবস্থিত মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। এছাড়া উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে জলসম্পদ ও জলবিদ্যুৎ সম্পর্কিত নানা প্রকার সহযোগিতা। এক্ষেত্রে ২০০৮ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভারত সরকার নেপালে ৪৫ কোটি টাকা অনুদান করেছে। এর মধ্যে রয়েছে কিছু উল্লেখযোগ্য জলবিদ্যুৎ প্রকল্প যেমন পঞ্চেশ্বর প্রকল্প, অরুণ-৩ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রভৃতি।

সুপ্রাচীন অতীত ঐতিহ্যের উপর গঠিত ভারত-নেপাল সম্পর্কে প্রথম প্রতিবন্ধকতার রূপ নেয় চিন। মূলত নেপাল, ভারত ও চিনের মধ্যে বাফার রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান করছে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চশীল চুক্তির পরিসমাপ্তির পর চিন নেপাল উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে চিন নেপাল চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পায়। মূলত উভয়ই দেশের এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নির্মাণের প্রধান কারিগর ছিলেন নেপালের রাজা মহেন্দ্র। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা ত্রিভুবন পরলোক গমনের পর মহেন্দ্র ক্ষমতাসীন হন এবং নেপালের উপর ভারতের প্রভাবকে হ্রাস করার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গোপনে চৈনিক ক্ষমতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকেন। ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত বান্দুং কনফারেন্সে উভয়ই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মিলিত হন এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে চিন নেপালকে সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দেয় এবং উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক সূচিত হয়। আবার ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে রাজা বীরেন্দ্র ক্ষমতাগ্রহণের পর ভারত ও চিনের প্রতি সমদূরত্ব বজায় রাখার নীতি ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে এটা বলা প্রয়োজন যে নেপালের চিনা তোষণ নীতির পিছনে একপ্রকার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ভারতের ওপর নেপালের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাকে হ্রাস করা এবং উভয় দেশের মধ্যে কোন প্রকার অসঙ্গতি দেখা দিলে চিনকে দাবার গুটি হিসাবে চালনা করা।

তবে ১৯৫৯ সালে চিনের আগ্রাসন নীতি ও তিব্বত দখল চিন-নেপাল সম্পর্কের ওপর একপ্রকার নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পরবর্তীকালে বি. পি. কৈরালার নেতৃত্বে গঠিত নতুন সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ভারত ও চিনের প্রতি ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে শান্তি ও মৈত্রী চুক্তির দ্বারা আবার নেপাল চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পুন:সূচনা ঘটে। কিন্তু ক্রমশও মাউন্ট এভারেস্টের উপর চিন তার দাবি তুলে ধরায় উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কিছুটা ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়াও নেপালের মুস্তাঙ জেলার কোরেপাস অঞ্চলের নিকট অবস্থিত নেপাল-চিন সীমারেখায় প্রাত্যহিক কার্যে নিযুক্ত নেপালের কিছু নিরস্ত্র সরকারি কর্মচারীগণের ওপর চিনা সৈন্যবাহিনী কর্তৃক গুণীবর্ষণ নেপালি জনগনের মধ্যে তীব্রভাবে নিন্দিত হয়েছিল। যাই হোক ১৯৬০ সালে নেপালের কৈরালা সরকার পদত্যাগ করলে নেপালের রাজা মহেন্দ্র আবার নেপালের প্রধান নীতি নির্ধারক হয়ে ওঠেন। ১৯৬১ সালে তিনি চিন ভ্রমণ করেন এবং চিনা সরকারের সঙ্গে সীমানা চুক্তি স্বাক্ষর ও তার পাশাপাশি কাঠমান্ডু থেকে তিব্বতি শহর কোদারি পর্যন্ত সড়ক পথ নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই সড়কপথ জনিত চুক্তিটি ভারতের নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়, কারণ হিমালয় পর্বতমালাকে ভেদ করে চিন-নেপাল সংযোগ রক্ষাকারী সড়ক বৈদেশিক শক্তি চিনকে ভারতে অনুপ্রবেশের এক সুযোগ করে দেয়।

১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে প্রতিবেশী দেশ নেপালের ওপর থেকে ভারতের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। পাশাপাশি চিনের প্রধান ঘোষণা করেছিলেন চিন ও নেপালের মধ্যে রক্তের ন্যায় সম্পর্ক রয়েছে, যা কোনো বহিঃশক্তি এই সম্পর্ককে নষ্ট করতে পারবে না। চিনা সরকার তার বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে এই প্রতিপাদ্য করার চেষ্টা করছে যে ভারতের প্রতি নির্ভরশীলতার কারণে নেপাল পূর্ণ স্বাধীন মর্যাদা উপভোগ করতে অক্ষম, তাই কাঠমাণ্ডু প্রশাসনকে নিজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে সরকারি নীতিতে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। বহুকাল আগেই একটি সুপার পাওয়ার দেশ রূপে চিনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সামরিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের বলই তৈরি করে বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলেই পৌঁছে গিয়েছে চিন। তাই চিনের বিদেশনীতিতে দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি। ভারতকেন্দ্রিক দক্ষিণ এশিয়ার পরিবৃত্তে চিন এক বহির্ভূত শক্তি। উদীয়মান শক্তি ভারত যে সম্ভাবনা নিয়ে দিন দিন অগ্রসর হচ্ছে তাতে চিন কিছুটা চিন্তিত। যদিও চিনের সমতুল্য হয়ে উঠতে পারেনি ভারত। দক্ষিণ এশিয়াই ভারতকেন্দ্রিক যে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির এককালীন প্যারাডাইম ভেঙে তা নতুন করে রণকৌশলের ছক কষছে চিন এবং এক্ষেত্রে নেপালকে সে গুরুত্বপূর্ণ গুটি হিসেবে ব্যবহার করতে চলেছে। ১৯৮০ এর দশকের প্রথম থেকে চিন দ্বারা মুক্তদ্বার অর্থনীতির সূত্রপাত ঘটে এবং ১৯৯০ এর দশকের প্রথম থেকে বিশ্বায়নের মূলমন্ত্র বাজার অর্থনীতি ও উন্মুক্ত পুঁজির চলাচল চিনের পণ্যকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। তারপর থেকে চিন নেপালকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে নেপালকে এক অনুগত রাষ্ট্রের পরিণত করতে সচেষ্ট চিন। দক্ষিণ এশিয়া রাজনীতি ভারতের প্রভাব খর্ব করে ক্ষমতার ভারসাম্য ও সমীকরণে নতুন রণকৌশল তৈরি করছে চিন। বস্তুত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন শহরে চিন নিজের চায়নাটাউন স্থাপন করে নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে আরও তৎপর হয়েছে। নিছক সহযোগিতার নামে উন্নয়নের স্লোগান দিয়ে নেপাল কার্যত এক নির্ভরশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেছে চিন। নির্ভরশীলতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় পরিণত না হলে নেপাল অদূর ভবিষ্যতে চিনের উপনিবেশে পরিণত হবে। আর নেপালের তিনদিক জুড়ে রয়েছে ভারত, কিন্তু দিনের পর দিন চিন যেভাবে তার প্রভাব নেপালের উপর বাড়িয়ে চলেছে, তাতে ভারতের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ছে। চিনের কাছে লক্ষ্য পরিষ্কার সেটি হল ভারতকে টেক্কা দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রকল্প গ্রহণ করে নেপালকে নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে ভারতের সঙ্গে দূরত্ব বৃদ্ধি করা।

নেপালে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, চিন তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অংশীদার নেপালের রাজাকে হারিয়েছিল, যিনি চিনের নিরাপত্তা স্বার্থে কাজ করতেন ও সমর্থন করতেন। ফলত নেপালে আবার চিনের একজন ভরসাযোগ্য বন্ধু ন্যায় প্রয়োজন হয়ে পড়ল এবং এক্ষেত্রে চিনকে নেপালের দুই রাজনৈতিক শক্তির মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিতে হবে। নেপালের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল যেমন গণতান্ত্রিক দল, যারা সাধারণত ভারতীয় ভাবনায় ভাবিত ছিল এবং মাওপন্থী দল, যা ছিল অতিমাত্রায় ভারত ও মার্কিন বিরোধী। এই সুবাদে চিন ঐতিহ্যবাহী মাওবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন শুরু করে।

সম্প্রীতি ২০২২ এর এপ্রিল মাসে নেপালের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা ভারত সফরে আসেন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, শক্তি, সুরক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক পর্যালোচনা করেন। এই সফরকালে দুই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে জয়নগর-কুরথা-বিজালপুর-বারদিবাস, যোগবানী-বিরাটনগর, রক্সৌল-কাঠমাণ্ডু

সংযোগকারী আন্তঃসীমান্ত রেল যোগাযোগ প্রকল্প শুরু করেন। এছাড়াও ভারতীয় রূপে (RuPay) কার্ডের ব্যবহার নেপালে চালু করা হয়। আশা করা হয় ইহা উভয় দেশের অর্থনৈতিক সংযোগ সহযোগিতার এক নতুন পথের সূচনা করবে, পাশাপাশি উভয় দেশের জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন আরও দৃঢ় হবে। পাশাপাশি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সৌর জোটে নেপালের যোগদানের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

যাই হোক শেষোত বর্তমান পরিস্থিতিকে উন্নত করতে ভারতকে অবশ্যই নেপালের প্রতি একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে হবে। কারণ নেপাল, চিনসহ বিভিন্ন বিদেশী অংশীদারদের সাথে সহযোগিতার সুযোগের সুবিধা নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতিমধ্যে চিন তার উদার কৌশলগত কূটনৈতিক দান প্রক্রিয়ার দ্বারা নেপালের মন জয় করতে সফল হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতের জন্য উচিত পন্থা হবে তার একচেটিয়াভাবে ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা কোণ থেকে খানিকটা সরে এবং উদ্ভাবনী কৌশল ও নীতির সাথে সক্রিয় হওয়া। এক্ষেত্রে ভারত সরকারকে প্রথমত ভারতের প্রতি নেপালের এহেন আচরণের প্রধান কারণগুলি সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন অর্থাৎ কেন নেপাল সুপ্রাচিন বন্ধু ভারতকে সরিয়ে চিনকে স্বাগত জানাচ্ছে। এছাড়াও ভারত সরকারকে নেপাল সরকারের সাথে নয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক অবকাঠামোগত উদ্যোগ প্রবর্তন করতে হবে । তবে উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ যাই থাকুক না কেন নেপাল ভারতের উপর থেকে নির্ভরতা সহজে দূর করতে পারবেনা, কারণ ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেপালের সামগ্রিক উন্নয়নে সর্বদা তার হাত বাড়িয়ে রেখেছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও বিশ্বজনিত কাঠামোর পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও তার পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদীর মতো নতুন হামলা প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ও নেপালকে এক স্থানে আসতে হবে। তবে শেষে এ কথা বলা যায় আমাদের নয়া দিল্লি যত কাঠমাণ্ডু থেকে দূরে সরে যাবে, ড্রাগনের নিঃশ্বাস ততই কাঠমাণ্ডুর ঘাড়ের উপর পড়তে থাকবে। তারপর বর্তমানে কোভিড মহামারীর প্রকোপে গোটা বিশ্ব তোলপাড়, যা অপর সীমান্তে থাকা মানুষদেরকেও প্রভাবিত করে। তাই এই সংকটপূর্ণ সময়ে একে অপরের প্রতি হাত বাড়িয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ বজায় রাখাটি উভয়ের পক্ষে লাভজনক।

গ্রন্থপঞ্জী:

1. Nandy, D. (2020). Revisiting India’s Post Cold War Foreign Policy : Since 1991-Present Day. Memari: Avenel Press.
2. Bandyopadhyaya, J. (1970). The Making of India's Foreign Policy: Determinants, Institutions, Processes, and Personalities. New Delhi: Allied Publishers.
3. Mitra, D. & Nandy, D. (2016). South Asia and Democracy: Contextualising Issues and Institutions. New Delhi: Kunal Books.
4. Dahal, G. (2015). Constitutional Assembly of Nepal Milestone for Peace, Development and Political Stability: KMC Journal of Interdisciplinary Studies, Vol.4.1, p.70-77.
5. Kumar, S. (1967). The Rana Polity in Nepal (1846-1951). Bombay: Asia Publishing House.
6. Shrestha, R. B. (2018). Foreign Policy Challenges and Opportunities. Kathamandu : The Rising Nepal.
7. Financialexpress.com. 2022. China in Nepal: Another proxy war with India? | The Financial Express. [online] Available at: https://www.financialexpress.com/defence/china-in-nepal-another-proxy-war-with-india/2588694/ [Accessed on 24 August 2022].
8. Ghoble, T. R. (1992). India and China - Nepal Relations, 1950-1980: An Appraisal. Proceedings of the Indian History Congress, 53, 598–606. http://www.jstor.org/stable/44142876
9. Dahal, G. (2018). Foreign Relation of Nepal with China and India. Journal of Political Science, 18, 46-61.
10. Shukla, D. (2006). India-Nepal Relations : Problems and Prospects. The Indian Journal of Political Science, 67(2), 355–374. http://www.jstor.org/stable/41856222
11. Sharma, B. (2018). China-Nepal Relations: A Cooperative Partnership in Slow Motion. China Quarterly of International Strategic Studies, 04(03), 439-455.
12. Baral, L. R. (1992). India-Nepal Relations: Continuity and Change. Asian Survey, 32(9), 815–829.
13. Sudheer Sharma, “Himal Pariko Herai (Views from the other side of the Himalayas),” Kantipur Daily, 06 July 2018, https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/07/01/153041014629187744.html